শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারঃ ভাষা আন্দোলনে অবদান

সুস্মিতা রানী দাস

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSusmita

শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন প্রগতিবাদী ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। মানবতাবোধ, মহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগের ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শহীদুল্লা কায়সারের জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই ভাষার প্রশ্নে ধর্মকে যুক্ত করার বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই তিনি উপলব্ধি করেন, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মূল করে বাংলা ও বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তাই প্রথম থেকেই তিনি বাংলা ভাষা-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সাংগঠনিক উদ্যোগের দায়িত্বে ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। ভাষা আন্দোলনের প্রথমদিকে তিনি ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করেন, সভা-মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকার দমন-নীতি প্রয়োগ করলে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হন। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি আন্দোলনের পেছনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণেই ১৯৫২ সালের জুন মাসে তাকে প্রথমবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপরীতে একটি সমন্বিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এটি শুরু হয় এবং বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেটি পরিণতি লাভ করে। তিনি শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল পাকিস্তানের সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের অবদান আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষকরে, একজন আত্মগোপনকারী নেতা হয়েও ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করতে তিনি যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

প্রবন্ধটি প্রধানত একটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সার কী ধরনের এবং কীভাবে ভূমিকা রেখেছেন, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিজীবন, রাজনীতি-সচেতনতা এবং আন্দোলন-সংগ্রামে সম্পৃক্ততা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান; এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রধানত 'ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সুভেনির প্রভৃতি উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া শহীদুল্লা কায়সারের পরিচিত বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস অপ্রতুল হওয়ায় দ্বৈতয়িক উৎসের উপর

গুরুত্ব দিয়ে গবেষণাটি করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের অবদানের ধারাবাহিক তথ্যের অভাব, তথ্য যাচাইয়ের উৎসের অপ্রতুলতা এই গবেষণাকর্মের একটি সীমাবদ্ধতা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য যুক্তির বিবেচনায় যাচাই করে গ্রহণ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এর বহুমাত্রিক সামগ্রিকতাকে উন্মোচন করা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। শহীদুল্লা কায়সারকে নিয়ে ইতঃপূর্বে এ ধরনের কোনো কাজ না হওয়ায় এর অ্যাকাডেমিক যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

ভাষার প্রশ্নে শহীদুল্লা কায়সারের অবস্থান

শহীদুল্লা কায়সার বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তানের মতো বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে সবাই নিজ নিজ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীবৃদ্ধি করলে পাকিস্তান দুর্বল না হয়ে আরো বেশি সবল হবে। বাঙালিরা যদি পীড়নের অনুভূতি থেকে মুক্ত হয় এবং তাদের স্বকীয় বিকাশের পথে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে দূরত্ব থাকলেও অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকবে। তাঁর মতে, অনেকেই মনে করেন পূর্ব-বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলেই এখানে স্বাতন্ত্র্য চিন্তা বেড়েছে। কথাটা আংশিক সত্য হলেও পুরো সত্য নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি সমৃদ্ধও হতো, তারপরও এখানে বাঙালি চেতনা জাগতো। কারণ ধর্মীয় চেতনার স্তর পেরিয়ে ভাষা ও জাতীয়তাভিত্তিক চেতনা আসবে এটা ঐতিহাসিক নিয়ম। এই নিয়মকে কেউ অস্বীকার করতে চাইলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। পাকিস্তানের সকল জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার এবং রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনার অধিকার দিতে হবে। জোর করে কোনো ভাষাকে অন্য ভাষাভাষী জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর সম-অধিকার ও সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাস থেকে 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এর পরিবর্তে 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিকে তিনি সঠিক বলে বিবেচনা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি এই নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর এই নীতিতে বিশ্বাসের বিষয়টি পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নিয়ে পত্রিকায় তাঁর লেখা থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় (*সংবাদ*, ১৯৭০, পৃ. ১, ৪)। এই নীতিগত অবস্থানের ফলে দু'টি বিষয়ে সুবিধা হয়- এক, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদাদানের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। দুই, পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী জনগণ ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে ভাষা আন্দোলনে সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করা সম্ভব হয়।

ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ, প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ, ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে প্রাপ্ত সে-সব তথ্য একেবারেই অপর্যাপ্ত। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকেই শহীদুল্লা কায়সারের নীতি বলা যায়। কারণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন। সাধারণ ছাত্রদের কাছে ছিল তাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা। ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্র ধর্মঘটগুলো সফল করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন আত্মগোপনকারী নেতা। তাই প্রকাশ্যে নেতৃত্ব দিতে না পারলেও গোপনে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন, তাদের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নিজ দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের সাথে

যোগাযোগ করেছেন, বৈঠক করেছেন, সিদ্ধান্ত-পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কেউ কেউ তাদের স্মৃতিচারণে শহীদুল্লা কায়সারের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই উল্লেখ করেননি বা লেখেননি।[১] তাই অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গেছে। যেহেতু ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু লিখে যাননি তাই ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের ভূমিকা বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো একত্রিত করে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের অবদানের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

রাজনীতি সচেতনতা

১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালীর জেলার ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামে শহীদুল্লা কায়সারের জন্ম (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ৩৪)। তাঁর পুরো নাম আবু নাসের মোহাম্মদ শহীদুল্লা, ডাকনাম কায়সার। পিতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ এই নাম রাখেন। মা সুফিয়া খাতুনের কাছেই শহীদুল্লা কায়সারের পড়ালেখার হাতেখড়ি। শৈশবে পড়াশোনা করেছেন বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে আমিরাবাদ হাইস্কুলে। তাঁর পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদের পরিবার কলকাতায় চলে যায়। শহীদুল্লা কায়সারকে কলকাতা মাদ্রাসা স্কুলে ভর্তি করা হয়। তাঁর সহপাঠী ছিলেন কলিম শরাফি ও কামরুল হাসান। তারা থাকতেনও দেবেন্দ্র ম্যানশনের মুখোমুখি ফ্ল্যাটে (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১৭-৪৩)। শহীদুল্লা কায়সার ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন প্রাণবন্ত স্বভাবের। ছোটোবেলা থেকেই শহীদুল্লা কায়সার মানুষকে খুব ভালোবাসতেন, মানুষের কথা ভাবতেন।[২] কলকাতা মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মার্কস ও লেনিনের বই পড়ে মানুষের জন্য, সমাজের জন্য ভাবনার উদ্রেক হয়। তাঁর কৈশোর শুরু হয় নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে। কৃতিত্বের সাথে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধাবী ছাত্র শহীদুল্লা কায়সার ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের পর তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সারের ইচ্ছা অনুযায়ী শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করে দেন। স্কুলজীবন পর্যন্ত তিনি কায়সার নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সবার কাছে শহীদুল্লা নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১৭-৪৩)। সে-সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন (নাঈম ও লাভা, ২০১৯, পৃ. ৩৮৮)। বিভিন্ন জায়গায় তাকে ছুটতে হতো। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতায় শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন অনবদ্য। তিনি হয়ে উঠেন কমিউনিস্ট পার্টির কিশোর সংগঠক। মিছিলে, আন্দোলনে, বক্তৃতার মঞ্চে সবজায়গায় তাকে দেখা যায়। তাঁর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, অমায়িক আচরণ ও দেশপ্রেমের কারণে অল্পদিনেই পার্টির সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন, বিভিন্ন ঘরোয়া বৈঠক করেছেন। হলওয়েল মনুমেন্টে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, পুলিশের আক্রমণের শিকারও হয়েছেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৫০-৭২)। তিনি কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা স্ট্রিটে বক্তৃতা দিতেন এবং মানুষ ভিড় করতো তার কথা শোনার জন্য (সাদিয়া, ২০২১, পৃ. ১৭৯)। মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় চরকায় সুতা কেটে কাপড় বোনার জন্য মা আর মামিকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর মাকে বলেছিলেন, "ঘরে ঘরে মা-বোনেরা চরকায় সুতা কেটে নিজের

কাপড় তৈরি করে। কেউ আর বিদেশী কাপড় পরবে না। আমার ইচ্ছা আমার মাও এ মহৎ কাজটা করবেন। লাইলী মামিকে আপনার সঙ্গে রাখতে পারেন" (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৭৩)। এ সময় থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়ে দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে রিলিফ ক্যাম্পের জন্য চাল, ডাল, কাপড় সংগ্রহ করেছেন। আবার দাঙ্গার দিনগুলোতে দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং হিন্দু-মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিন-রাত কাজ করেছেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৮৬-১০০)। তিনি ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অর্থনীতি বিভাগ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি একইসাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন (বড়ুয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১৩)।

ভাষা আন্দোলন ও শহীদুল্লা কায়সার

ভারত-বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে গেলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ধর্মকে জুড়ে দিয়ে উর্দুর পক্ষে প্রচারণা চালানো হতে থাকে। তখন থেকেই ভাষার প্রশ্নে শহীদুল্লা কায়সার বিভিন্ন আলোচনায় দৃঢ়ভাবে বলেছেন, বাঙালি মুসলমানের ভাষা অবশ্যই বাংলা, উর্দু নয়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার পার্টির কিছু কাজে বালিগঞ্জে রোকেয়া কবিরের বাসায় যান। সেদিন রোকেয়া করিরের সাথে ভাষা নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে তিনি মন্তব্য করেন, ধর্মের সঙ্গে ভাষার বিষয়টি যুক্ত করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। সরলপ্রাণ ধর্মবোধকে উসকে দেওয়া হচ্ছে 'বাংলা'র বিরোধিতা করে। তিনি বলেন:

> কেউ যদি উর্দুকে ভালোবাসে সে আলাদা কথা। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ থাকা উচিত নয়। আধা বাঙালি, উর্দুভাষী রক্ষণশীল খাঁটি বাঙালির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে মুসলিম সম্প্রদায় যদি পাকিস্তান সৃষ্টির নামে উর্দুর পক্ষে প্রচার চালায় তার ফল ভালো হবে না (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১১০)।

বন্ধু কলিম শরাফি ও কামরুল হাসানের সাথে আলোচনায়ও তিনি বলেছিলেন, বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার বিরোধিতা করার জন্য ধর্মকে টেনে আনার আশঙ্কা আছে। তিনি বলেন, অনেক রক্ষণশীল মুসলমানকে তিনি বলতে শুনেছেন মুসলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্মগত। ধর্মের অজুহাতে অনেকেই মুসলমানদের ভাষা উর্দু বা আরবির পক্ষে কথা বলছেন। জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে উর্দু আর বাংলা নিয়ে সংকটের মুখোমুখি হতে হবে এটি চিন্তা করে তিনি বিচলিত হন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার প্রশ্নে ধর্ম যেমন একটি বিরাট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি মনে হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে ভাষার বিষয়টি নিয়েও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে" (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১১১-১১২)। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর যখন কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ফিরতে হবে তখন তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দেয় হিন্দুর জন্য আলাদা রাষ্ট্র, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কি আসলেই প্রয়োজন ছিল। ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ কীভাবে সমাজের বা মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এসব ভেবে তিনি বিচলিত হন। দেশ-বিভাগের পর পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার জন্য পার্টির নেতাকর্মীদের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। শহীদুল্লা কায়সার বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। পার্টির আদর্শকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, সাধারণ অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিক দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পার্টির দায়িত্ব নিয়ে ঢাকা আসার প্রস্তুতি নেন। দেশ-ভাগের পর তাঁর পরিবার পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসে এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি

বিভাগে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন। থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠিত করা এবং পার্টির পক্ষে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শহীদুল্লা কায়সারকে। ইতোমধ্যে ছাত্রদের কাছে শহীদুল্লা কায়সার জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। হল থেকে হলে, বিভাগ থেকে বিভাগে পার্টির কাজে তিনি ছুটেছেন ছাত্রদের কাছে। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ছাত্রমহলে প্রিয় হয়ে ওঠেন। ঢাকায় আসার পর শহীদুল্লা তাঁর নামের সাথে কায়সার জুড়ে দেন। ডাকনাম ও ভালো নামের সমন্বয়ে হয়ে ওঠেন শহীদুল্লা কায়সার (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১২০-১৪৪)। সে-সময় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীসংখ্যা অনেক কম থাকায় ছাত্রদের পাশাপাশি শ্রমিকদের মাঝেও কাজ করতে হতো তাকে (বড়ুয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১৪)। সে-সময় সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য হওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য ও দায়িত্বশীলতার জন্য কারণে তিনি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার হয়েছিলেন (হক, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন

মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা-বিরোধী কার্যকলাপ ও গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হলে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় শহীদুল্লা কায়সারসহ রণেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, আনোয়ারা খাতুন, শামসুদ্দীন আহমদ, মহীউদ্দিন, আলী আহমেদ, শামসুল আলম, শওকত আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, আবদুল আওয়াল, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন ও ছাত্র হলের ২ জন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। সংগ্রাম পরিষদের সাব-কমিটি গঠিত হয় এবং সাব-কমিটি ৪ ও ৫ই মার্চ বিকেলে ফজলুল হক হলে দু'টি বৈঠক করে। বৈঠকে ১১ তারিখের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় (হেলাল, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩-২৫৪)। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং সেই সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হলে সব মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গণপরিষদের বাংলা ভাষা-বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয় (মতিন, ১৯৮৬, পৃ. ৭-৯)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে ছাত্র-ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, শহীদুল্লা কায়সার তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (মুকুল, ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ. ৭৯)। ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারিয়েট ইডেন বিল্ডিং-এর বারান্দায় টুলের উপর দাঁড়িয়ে মাতৃভাষার সমর্থনে যুক্তি দিয়ে গুছিয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর সেই বক্তৃতা উপস্থিত সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল (কায়সার, ২০০০, পৃ. ভূমিকা)।

আত্মগোপনে থেকে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান

১৯৪৮ সাল থেকে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমন-নীতি চালায়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দলকে নির্মূল করে দেওয়া। সরকারের আক্রমণ থেকে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য পার্টির অনেক নেতা ও কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হন (রায়, ১৯৮৬, পৃ. ৯৬-৯৭)। সরকারের দমন-পীড়নে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা কোণঠাসা অবস্থার মধ্যেও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং সকল ভাষার সমান অধিকারের প্রশ্নে অটল থাকেন। (সারাবাংলা, ২০২৩) শহীদুল্লা কায়সার আত্মগোপনে যান।[৩] এবং পলাতক থেকেই ছাত্রদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। পলাতক থাকার কারণে তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিতে পারেননি (নাঈম, ও লাভা, ২০১৯, পৃ. ৩৮৯)। বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ায় ছাত্রজীবন থেকেই বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি (কায়সার, ২০১৯, পৃ. ১০৯)। আত্মগোপনে থেকেও ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী লিখেছেন:

> কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়েছে ঃ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছেন সব কম্যুনিস্ট কর্মি ও নেতাগণ। শুরু হয়েছে রণদিভে যুগের রোমাঞ্চকর ও হিংস্র নিপীড়নের দিনগুলি। এখানে সেখানে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি একটি নাম- শহীদুল্লা কায়সার। তিনি যেন রূপকথার রাজকুমার। সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম মৌলানা হাবিবুল্লার পুত্র কম্যুনিস্ট। বায়ুর ন্যায় সর্বত্র তাঁর গতি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি থেকে শুরু করে জয়দেবপুরের গভীর জঙ্গলে কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন সভায়। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের সময়েও বার বার শুনেছি এ নামটি। কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদুল্লা কায়সার (কায়সার, ২০০০, পৃ. ভূমিকা)।

আত্মগোপনে থেকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা শহীদুল্লা কায়সারের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি অনেকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। শেখ মুজিবের সাথে আলাপচারিতার কথা উল্লেখ করে শহীদুল্লা কায়সার লিখেছেন, "সে সময়ের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে মুজিব বললো মনে আছে তোর সে সব কথা? কায়ক্লেশে একবেলা খাবার জুটতো। লোকে এক রাত্রি আশ্রয় দিতে ভয় পেতো" (*সংবাদ*, ১৯৭০, পৃ. ১)। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ব্যাখ্যা করে ইশতাহার ছাপা, প্রচার ও বিলি করতে দিয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এমনকি নিজ পার্টির সদস্যদের কেউ কেউ তাঁর কাজের বিরোধিতা করেছেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৯২-৯৩)। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে খোকা রায় লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া বা ভালো ক্যারিয়ারের কথা না ভেবে আত্মগোপনের জীবন বেছে নিয়ে সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। পূর্ব-বাংলার বুদ্ধিজীবীদের থেকে কমিউনিস্ট পার্টি যে কয়েকজন কর্মী পেয়েছিল, শহীদুল্লা কায়সার তাদের মধ্যে একজন সেরা কর্মী ছিলেন। (*সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৯) বাম রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি (আলী, ১০ই জুন ২০২৪)। ভাষা আন্দোলনে সাধারণ জনগণকে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন সফল হবে না এই উপলব্ধি থেকে ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালাতে গেলে শহীদুল্লা কায়সার-সহ ৭/৮ জন ছাত্রকর্মীকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। মুহাম্মদ তকিয়্যুল্লাহর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের দিকে তিনি, শহীদুল্লা কায়সার, আনোয়ারুল আজিমসহ কয়েকজন ঢাকেশ্বরী কটন মিলে যান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের চেতনা জাগ্রত করা। মিল মালিকরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করেছিলেন। শ্রমিকদের সাথে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত মিটিং করে তারা। রাত হয়ে যাওয়াতে মিল মালিকরা তাদেরকে মিলের লঞ্চে যেতে বলেন। দু'একজন শ্রমিক গোপনে এসে তাদেরকে খবর দেয় তারা যেন লঞ্চে না যায়, সেখানে পুলিশ অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে পারেনি মিল মালিকরা পুলিশে খবর দিবে। তারা লঞ্চঘাটে যাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে এবং থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেওয়ার পর পুলিশ পরিচয়

জানতে পারে যে তারা ভদ্রঘরের ছেলে। মিল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দিয়েছিল মিলের ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা গিয়েছিল। পুলিশ বুঝতে পারে তারা খারাপ লোক নন, ছাত্র। থানায় সারারাত শহীদুল্লা কায়সারসহ সকলে মিলে তাস খেলে পার করেন। পরের দিন এসডিও-এর সাথে তারা দেখা করে এবং আনোয়ারুল আজিম পূর্ব পরিচিত হওয়ায় পুলিশের এসডিও তাদেরকে ভালো আপ্যায়ন করে ছেড়ে দেয় (বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৩৭)। ভাষা আন্দোলনের সময় অনেকেই বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলে। শাসকদের চরম বাঙালি বিদ্বেষ মনোভাবের কারণেই বাঙালি ছাত্র-যুবকদের মধ্যে উর্দু-বিদ্বেষী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। ছোটো-বড়ো সব জাতির সমান অধিকার থাকবে, নিজ নিজ ভাষার পূর্ণ অধিকার থাকবে সে-সময় সে-কথা বোঝানো প্রায় অসম্ভব ছিল। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শহীদুল্লা কায়সার এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছিলেন। দিন-রাত সবার সাথে আলোচনা, আন্তরিক ব্যবহার ও সবিনয় যুক্তি দিয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের তাঁর যুক্তির পক্ষে আনতে সমর্থ হন। শহীদুল্লা কায়সার দক্ষতার সাথে বোঝাতে সক্ষম হন যে বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা দাবি করলে ভাষা আন্দোলন জাত্যাভিমানের পথে চলে যাবে।[৪] ফলে ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগান 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' পরিবর্তিত হয়ে হলো 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' (*সংবাদ*, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১-২)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে ছাত্রদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ রক্ষা করতেন শহীদুল্লা কায়সার (চৌধুরী, ১লা অক্টোবর, ২০২৪)। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি ছাত্র আন্দোলনে পার্টি কর্মীদের পরিচালনা করতেন ও নির্দেশ দিতেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাদের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। তারা পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশমতো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভায় মতামত প্রকাশ করতেন। এক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি কমিটির বৈঠকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদিন মূল আলোচনা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্পর্কে শহীদুল্লা কায়সার বদরুদ্দীন উমরকে জানিয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টির ৫ সদস্য তোয়াহা, অলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সামাদ ও তকিউল্লাহর কাছে পার্টির নির্দেশ ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য সভায় চাপ প্রয়োগ করা। তবে যদি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের এ ব্যাপারে রাজি করানো না যায় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলা হয়। সভার কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যায় অধিকাংশই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিপক্ষে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো অবস্থাতেই ভাঙন ঘটতে দিবে না। কোনো চরমপন্থাকে উৎসাহিত করলে সেটি সরকারের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। তাই পার্টির সদস্যদের কাছে নির্দেশ পৌঁছায় তারা যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য চাপ সৃষ্টি না করে। এছাড়া সদস্যরা যেন সভায় তুলে ধরে যে-কোন জরুরি অবস্থার ফলে আগামী সাধারণ নির্বাচন স্থগিত হয়ে যেতে পারে এবং নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেলে সেটি পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক জীবনে বড়ো ধরনের বিপত্তি ডেকে আনবে (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯)। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী মোহাম্মদ সুলতান তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, শহীদুল্লা কায়সার এবং মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছিলেন ১৪৪ ধারা ভাঙা ঠিক হবে না বলে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত মেনে যেন সত্যাগ্রহীর আকারে পালন করে। অর্থাৎ, ১০/১১ জনের দল করে একে একে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেন বের হয়। আন্দোলন যাতে বিশৃঙ্খল না হয়ে সেজন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছিল (কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা)।

এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিক লিখেছেন, ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা নেতা শহীদুল্লা কায়সার মেডিকেল হোস্টেলে আহমদ রফিকের কক্ষে গিয়েছিলেন ১৪৪ ধারা অমান্য করা সম্পর্কে ছাত্রদের অভিমত জানতে। একই উদ্দেশ্যে শহীদুল্লা কায়সার ঢাকা হল এবং ফজলুল হক হলেও গিয়েছিলেন। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদলীয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ও বিভক্তির পক্ষে ছিল না। যে-কারণে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের মনোভাব যাচাই-এর পর তাদের মত পাল্টায়। মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, এফএইচ হল, জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙতে প্রস্তুত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে শহীদুল্লা কায়সার বেরিয়ে যান। কিন্তু রাতের সভায় মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নির্দেশ যায়নি। আহমদ রফিকের মতে, এর কারণ হতে পারে সেদিন রাত পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যেখানে ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরুদ্ধে ছিল, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির মতো আত্মগোপনকারী দলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। শহীদুল্লা কায়সারের ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের মতামত যাচাই করা থেকে তা বোঝা যায়। তারা সাধারণ ছাত্রদের মতামতের ওপর বিষয়টা ছেড়ে দিয়েছিলেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮২-৮৪)। ভাষা আন্দোলনের সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল ব্যারাকে আত্মগোপনে থেকে শহীদুল্লা কায়সার পার্টির পক্ষ থেকে আন্দোলন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন (কমিউনিস্ট পাটি, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা)। ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর ডাকনাম ছিল তালেব ভাই। আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট নেতা হওয়ায় ২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে তিনি যোগ দিতে পারেননি। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে তিনি মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণে ছাত্রজমায়েতের পরবর্তী করণীয় কী সে সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। পরবর্তী দুই/তিনদিন হোস্টেলেই থেকেছেন এবং নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮৬-৯২)।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করা হয়। সেখানে থেকে ছাত্রনেতারা মাইকে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে নির্দেশ দেন। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মী শহীদুল্লা কায়সারও এদিন অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা দেন (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৭)। রফিকুল ইসলাম সে-দিনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, "...একুশে বিকেলে মেডিক্যাল হোস্টেল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাইক্রোফোনে কণ্ঠ শোনা যায় ছাত্র নেতাদের এবং দীর্ঘদিন আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী শহীদুল্লাহ্ কায়সারের..." (ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)। গুলি বর্ষণের পরে সে-দিনই শহীদুল্লা কায়সার, অলি আহাদ, তোয়াহা, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, মাহবুর জামাল জাহেদী, কবিরউদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ সহ আরো কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে একটি ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন রাতেই গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে একটি নতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া বৈঠকে তহবিল, মাইক্রোফোন ক্রয়, লিফলেট ছাপা ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয় (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৯-৩১০)। নানা কারণে স্তিমিত ভাষা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ৯ই মার্চ [৫] শান্তিনগরে ছাত্রযুব নেতৃত্বের বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগ নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং বৈঠকে সব মতাদর্শের নেতাদের ডাকা হয়েছিল (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮৭)। তবে বদরুদ্দীন উমর এই বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন, ৭ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভা আহ্বান করা হয় শান্তিনগরে একজন চিকিৎসকের বাসায়। এই বৈঠকের গোপনীয়তা রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। কারণ ইতোমধ্যে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের নামে গ্রেফতারি

পরোয়ানা জারি হয়েছে। আত্মগোপনকৃত অনেক নেতা গোপনে বৈঠক করবেন তাই সংগঠকরা যথেষ্ঠ সতর্ক ছিলেন। শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ৭ই মার্চের বৈঠকটি শহীদুল্লা কায়সার ডাকতে চাইলে প্রথমে কর্মীরা কিছুটা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দদের (যারা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন) সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং পার্টির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন, তাই কমিটির সদস্য না হয়েও ৭ই মার্চের বৈঠকে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনগরে গিয়েছিলেন। মাহবুব জামাল জাহেদীকে সাথে নিয়ে তিনি নির্ধারিত স্থানে রওয়ানা হন। নির্ধারিত বাড়িতে ঢোকার আগে তিনি জাহেদীকে নির্দেশ দেন বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে বৈঠকে কোনো বাইরের লোক আছে কি না। যেহেতু তিনি আত্মগোপনে ছিলেন তাই অপরিচিতদের সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে তাঁর অসুবিধা ছিলো। শহীদুল্লা কায়সার দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জাহেদী বাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন বাড়িটি পুলিশ ঘেরাও করতে চলেছে। ফলে তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান। সেদিন পুলিশ বাড়িটি ঘেরাও করে সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করেছিল। তবে মাহবুব জামাল জাহেদী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ঐদিন শহীদুল্লা কায়সারের সাথে শান্তিনগর এলাকায় যাননি। উভয়ের বিবরণ একেবারে ভিন্ন হওয়ায় বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, শহীদুল্লা কায়সারের সেদিনের বিস্তৃত বিবরণ থেকে মনে হয় তিনি হয়তো অন্য কারো সাথে সেখানে গিয়েছিলেন। স্মৃতিভ্রমের কারণে সেই কর্মীর নাম মনে করতে না পেরে তাকে জামাল জাহেদী বলে ভুল করেছেন। আবার মাহবুব জামাল জাহেদীরও স্মৃতিভ্রম হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪৩-৪৪৮)। মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদসহ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়াতে ভাষা আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল (রায়, ১৯৮৬, পৃ. ১১৯)। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। তারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে এ-সময় ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে যথেষ্ঠ তৎপরতা অব্যাহত ছিল (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৪৫৬)। শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫২ সালের ৩রা জুন তিনি গ্রেফতার হন। (*বাংলাপিডিয়া*) ভাষার দাবিতে সভা, বক্তৃতা, বিবৃতি অব্যাহত থাকে। সেই সাথে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিও উচ্চারিত হতে থাকে।[৬] সারাদেশে ১৯৫৩ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করা শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সেই সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (সিদ্দিকী, ২০০৬, পৃ. ৩১৫-৩১৬)। শহীদুল্লা কায়সার মনে করতেন, সরকার যতই জনপ্রিয় কিংবা শক্তিশালী হোক, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপন্থী নীতি দীর্ঘদিন চালু রাখা যায় না। এর প্রমাণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার একগুয়েমি কার্যক্রমের ব্যর্থতা (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ১)।

একুশের চেতনা ও শহীদুল্লা কায়সার

ইতালীয় মার্কসবাদী দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির 'বুদ্ধিজীবী' ধারণার নিরিখে শহীদুল্লা কায়সার একজন প্রকৃত সৃষ্টিশীল বা অর্গানিক বুদ্ধিজীবী। গ্রামসি মনে করেন, অর্গানিক বুদ্ধিজীবী কেবল পেশাদার জ্ঞানচর্চা করেন না, বরং তিনি সমাজের নিচু তলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেন (Gramsci, 1971, pp. 9-12)। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর লেখনীতে শ্রমিক, কৃষক, নারীর অধিকার, সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি জনগণের পক্ষে

অবস্থান নিয়েছেন, নিপীড়িতের ভাষা হয়েছেন এবং জাতির চেতনার নির্মাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন একজন প্রগতিশীল কমিউনিস্ট চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক। মার্কসবাদী ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি মানবমুক্তি, শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্য এবং শোষণমুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখতেন। একজন কমিউনিস্ট হয়েও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালির জাতিগত মুক্তি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রেণি-নিপীড়নের বিরুদ্ধেই এক ধরনের সংগ্রাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মুক্তির সংগ্রাম কেবল অর্থনৈতিক শোষণ-বিরোধী লড়াই নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে।

শহীদুল্লা কায়সার মনে করেন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রথমবার পূর্ব-বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছিল। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে একটি বিস্ফোরণের দিন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫, পৃ. ৬)। তিনি লিখেছেন, একুশ আমাদের ঐক্যের শিক্ষা দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলীন করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতন্ত্রের সমন্বয়ে যে ত্রিশক্তির আঁতাত হয়, সেই আঁতাতের উপর প্রথম আঘাত হচ্ছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ৮)। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে আগামী দিনের সংকল্প গ্রহণের সুবর্ণ মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শাসকগোষ্ঠী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতামুখী চিন্তার অভিযোগ এনেছিল সেটি ছিল মিথ্যা অভিযোগ যা পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করে। তাঁর কাছে "একুশের চেতনা ছিল গঠনমুখী এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াসী" (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ৪)। একুশের সংগ্রামে প্রগতিশীল শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একুশের সংগ্রামে ছিল না কোনো সংকীর্ণ চিন্তা। বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকারের পাশাপাশি সকল ভাষার স্বাভাবিক স্ফুরণের দাবি করা হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন যেমন ছিল সংকীর্ণতা-মুক্ত, তেমনি ভাষাগত অভিমানও ছিল না। ফলে শাসকগোষ্ঠী বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে আন্দোলনে চিড় ধরাতে পারেনি (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ১)। ১৯৬৪ সালে এক সভায় শহীদুল্লা কায়সার বলেছিলেন, "একুশে ফেব্রুয়ারি'র মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলা ভাষার কোমলতাই আর শ্যামলিমাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে বাংলা একটি অগ্নি স্ফুলিংগ" (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪, পৃ. ৬)। তিনি নিরানন্দ, যন্ত্রণাময়, ভয়ার্ত জীবনে একুশের ভোরকে উজ্জল, রক্তিম, প্রসন্ন প্রহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ. ৪)। ১৯৬৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি *সংবাদ* পত্রিকার বিশেষ 'শহীদ দিবস' সংখ্যায় 'তোমাদের জন্যে' শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন শহীদুল্লা কায়সার। এই কবিতাটি তিনি ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। ভাষা শহীদদের আত্মদান বাঙালির জন্য গৌরবের, তাই তাদের জন্য কান্না পায়না বা আক্ষেপ হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮, পৃ. ১):

তোমাদের জন্যই
একটি হৃদয়
সহস্র হৃদয়ে স্পন্দিত
একটি চেতনা
সহস্র বোধনে জাগ্রত
একটি ধ্বনি

অজুত কণ্ঠে উচ্চারিত
একটি মৃত্যু
সহস্য জীবনের অঙ্গীকার
একটি দিন
শতাব্দীর সম্ভার।

টীকা

১. অনিল মুখার্জি লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলন নিয়ে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। অনেকের লেখায় এমন একটা ভাব যেন, তারা ইতিহাস রচনা করছেন; কিন্তু ভয়বশতঃই হোক, অথবা সঙ্কীর্ণ চিন্তা হতেই হোক, তাঁরা কেউই প্রায় তাঁদের লেখায় শহীদুল্লার নামও উল্লেখ করেননি। কিন্তু শহীদুল্লাকে বাদ দিয়ে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলা কতকটা রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ বর্ণনার মতো।" বিস্তারিত, *সংবাদ* (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২)। শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ১-২

২. এমনি একটি উদাহরণ পাওয়া যায় পান্না কায়সারের লেখায়। একদিন শহীদুল্লা কায়সারের পিতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ কাচারি ঘরে চেয়ারে বসে দুজন চাষির সাথে কথা বলছিলেন জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে। চাষি দুজন তাঁর পিতার চেয়ারের পাশে মাটিতে হাঁটু গেড়ে কথা বলছিল। শহীদুল্লা কায়সার পাশেই কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ যখন তিনি দেখেন চাষি দুজন হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলছে তখন তিনি দূরে রাখা টুল টেনে নিয়ে গিয়ে চাষিদের বসতে বলেন। চাষিরা ছোট কায়সারকে বুকে জড়িয়ে ধরে। শহীদুল্লা কায়সার বলতেই থাকেন আপনারা টুলে বসুন, মাটিতে বসলে ঠান্ডা লেগে যাবে। বিস্তারিত, কায়সার, পান্না (২০২০), *একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ. ৩৭

৩. শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে প্রায় ৩০ জন আন্ডারগ্রাউন্ড নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়, ৯ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। বিস্তারিত, রায়, খোকা (১৯৮৬) *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ১০৬-১০৮

৪. তাঁর দক্ষতার কারণে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সবাইকে এবিষয়ে সঠিকভাবে বোঝানো সম্ভব হয় এবং সংগ্রাম কমিটির ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিস্তারিত, *সংবাদ*, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৯-১০

৫. আহমদ রফিক বৈঠকের তারিখ ৯ই মার্চ উল্লেখ করছেন। তবে বদরুদ্দীন উমর এই বৈঠকের তারিখ উল্লেখ করেছেন ৭ই মার্চ

৬. শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৬ সালে মুক্তি পান। ১৯৫৮ সালের ১৪ই অক্টোবর সামরিক শাসক কর্তৃক তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২ সালে মুক্তি লাভ করেন। বিস্তারিত, বড়ুয়া, সুব্রত (১৯৮৮) *শহীদুল্লা কায়সার (জীবনী গ্রন্থমালা ১৯)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৯-৩১

তথ্যসূত্র

মুকুল, আখতার (সম্পা.)। *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮২)। *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*। ঢাকা: আনন্দ প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৪)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড। ঢাকা: বইঘর।

কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ (১৯৮৯)। *ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন*। ঢাকা: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

কায়সার, পান্না (২০১৯)। *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

কায়সার, পান্না (২০২০)। *একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

কায়সার, শহীদুল্লা (২০০০)। *সংশপ্তক*। ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী।

কায়সার, শহীদুল্লা। *বাংলাপিডিয়া*। https://en.banglapedia.org/index.php/Kaiser,_Shahidullah

চৌধুরী, শামীমা (২০১৫)। শহীদুল্লা কায়সার ও মো. শাহ আলমগীর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক*। ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

নাঈম, আলী মো. আবু ও লাভা, ফাহিমা কানিজ (২০১৯)। *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

বড়ুয়া, সুব্রত (১৯৮৮)। *শহীদুল্লা কায়সার (জীবনী গ্রন্থমালা ১৯)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বাংলা একাডেমী (সম্পা.) (১৯৮১)। *একুশের সংকলন ১৯৮১: স্মৃতিচারণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মুকুল, এম আর আখতার (১৩৯১)। 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং রক্তাক্ত একুশের ঘটনাপঞ্জি'। গাজীউল হক ও এম আর অনিল মুখার্জি [সম্পা.]। *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মতিন, আবদুল (১৯৮৬)। *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*। ঢাকা: নন্দন প্রকাশন।

রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি: তমদ্দুন মজলিশ ও কমিউনিস্ট পার্টি*। ঢাকা: বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা।

রায়, খোকা (১৯৮৬)। *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

সাদিয়া, সুপা (২০২১)। *মুক্তিযুদ্ধে শত শহিদ বুদ্ধিজীবী*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা।

সিদ্দিকী, ড. রেজোয়ান (২০০৬)। *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*। ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী।

হক, গাজীউল (১৩৯১)। 'একুশের স্মৃতিচারণ'। গাজীউল হক ও এম আর আখতার মুকুল (সম্পা.)। *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশাস।

হেলাল, বশীর আল্ (১৯৯৯)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

পত্রিকা

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪।

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫।

সংবাদ, শহীদ দিবস সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮।

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

সংবাদ, শহীদ দিবস সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

সংবাদ, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
সংবাদ, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
সারাবাংলা, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। https://sarabangla.net/post/sb-747979/

সাক্ষাৎকার

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১লা অক্টোবর, ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।

হক, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল (২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: নিজ বাসভবন, রোড নং-১, পরিবাগ, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।

আলী, ডা. সারওয়ার (১০ই জুন ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন, রোড নং- ১৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।